‘বুদ্ধির মুক্তি’ আন্দোলনের শতবর্ষে বাঙালি মুসলমান

ধর্ম-আলোচনায় কিংবা এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে যুক্তির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তারপরও অনেকে মনে করেন, ধর্ম ও যুক্তি পরস্পরবিরোধী। মনে করা হয়, একই সঙ্গে ধর্ম ও যুক্তিবাদের চর্চা সম্ভব নয়। আসলে এমন ধারণা সঠিক নয়, বরং অসম্পূর্ণ ও অযৌক্তিক। যারা ধর্ম মানেন, পালন করেন তারা যে সবাই যুক্তিবিধর্ম-আলোচনায় কিংবা এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে যুক্তির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তারপরও অনেকে মনে করেন, ধর্ম ও যুক্তি পরস্পরবিরোধী।রোধী, এমন নয়। ধার্মিক ও ধর্মবেত্তা তফসিরকারকদের মধ্যে অনেকেই যুক্তির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন অকপটে।

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে আমরা বেশ কয়েকজন যুক্তিবাদী ও মুক্তচিন্তার বাঙালি মুসলমান তরুণের সাক্ষাত পাই যাদের অন্তর্লোক ধর্ম-আধ্যাত্মিকতা ও যুক্তিবাদের আলোয় উদ্ভাসিত ছিল। ১৯২৬ সালে ঢাকায় ‘বুদ্ধির মুক্তি’ আন্দোলন নামে যে বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের সূচনা হয়, তার প্রবক্তা, কর্মী, সংগঠকরা অধিকাংশই ছিলেন ধর্মনিষ্ঠ অথবা ধর্মজিজ্ঞাসু। এদের মুখপত্র ‘শিখা’র মর্ম শ্লোগান ছিল ‘জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব’।

বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত আবুল হুসেন, অধ্যাপক কাজী আব্দুল ওদুদ, কাজী আনোয়ারুল কাদির, অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল ফজল, আবদুল কাদির প্রমুখ ছিলেন ধর্মবোধসম্পন্ন যুক্তিনিষ্ঠ মানুষ। এঁদের উদ্যোগ ও নেতৃত্বেই এই বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন গড়ে ওঠে, যাকে অন্নদাশঙ্কর রায় ‘দ্বিতীয় রেনেসাঁ’র সঙ্গে তুলনা করেছেন। এ আন্দোলনের সংগঠকরা যুক্তি ও ধর্মের সমন্বয়ে একটি যুক্তিনির্ভর জীবনাদর্শ গড়তে যে ত্যাগ স্বীকার করেন তা বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে সত্যিই বিরল। এঁদের প্রতিষ্ঠিত ‘মুসলিম সাহিত্য সমাজ’ (১৯ জানুয়ারি, ১৯২৬) বাঙালি মুসলমান তরুণদের চিত্তে ও চেতনায় বিশাল প্রভাব বিস্তার করে। সাহিত্য-সমাজ চেয়েছিল বাঙালি মুসলমান সমাজের চিন্তার পরিধিকে বিস্তৃত করতে। অন্ধ সংস্কার, শাস্ত্রাচার, সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা, গোঁড়ামি থেকে মুসলমান সমাজকে মুক্ত করতে।

কাজী নজরুল ইসলামও এ আন্দোলনের প্রতি সংহতি জ্ঞাপন করেছিলেন। এক পর্যায়ে আন্দোলনের প্রধান সংগঠক ও শিখা’র সম্পাদক আবুল হুসেন ও তাঁর সহযাত্রীদের ওপর নেমে আসে মুসলিম রক্ষণশীলতার খড়গ। তাঁদের ধর্মবিরোধী আখ্যা দেওয়া হয়। আবুল হুসেনের ‘আদেশের নিগ্রহ’ প্রবন্ধটি ‘শান্তি’ (আশ্বিন ১৩৩৬) পত্রিকায় প্রকাশের পর তর্ক-বিতর্কের ঝড় ওঠে। আন্দোলন মুখ থুবড়ে পড়ে। ‘আবুল হুসেন তখন ঢাকা জজ-কোর্টের উকিল।—- ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর রবিবার “আহসান-মঞ্জিলে আঞ্জুমান অফিসে এক বিশেষ সভার অধিবেশন হয়; সভায়” আবুল হুসেন হুমকীর মুখে এই বলে ‘ক্ষমাপাত্র’ লিখে দেন: “এই প্রবন্ধের ভাষা দ্বারা মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দের মনে যে বিশেষ আঘাত দিয়াছি, সেজন্য আমি অপরাধী।’ (আবুল হুসেনের রচনাবলী, আবদুল কাদির সম্পাদিত, ঢাকা, অক্টোবর ১৯৬৮; পৃ. ‘ভূমিকা’-১৫।) মুসলিম সাহিত্য সমাজের দুই প্রাণপুরুষ আবুল হুসেন ও কাজী আব্দুল ওদুদ ‘মুসলিম সাহিত্য সমাজে’র কাজ বন্ধ রেখে ঢাকা ছাড়তে বাধ্য হন। থিতু হন কলকাতায়। পৃষ্ঠপোষকতা ও উদ্যোগের অভাবে ‘শিখা’র দ্যুতি ক্রমশ ফিকে হতে থাকে।

শিখাগোষ্ঠীর সংগঠক-চিন্তক-লেখকরা কেউ নাস্তিক বা ধর্মবিরোধী ছিলেন না। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যিকারের জীবনাদর্শের আলোকে এঁরা নিজেদের তৈরি করতে চেয়েছিলেন। পাশাপাশি রামমোহন, ডিরোজিও, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, তুরস্কের কামাল আতার্তুক, পারস্যের শেখ সাদি, ফরাসি লেখক-দার্শনিক রোম্যা রোঁলাও তাদের চিন্তাবিশ্বকে আলোড়িত করেছে। সাহিত্যিক ডা. লুৎফর রহমানের সাহিত্যিক চিন্তাধারাও শিখাগোষ্ঠীকে অনুপ্রাণিত করেছে। ডা. লুৎফরের সাহিত্যচর্চার মূল উদ্দেশ্য ছিল মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ। তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন মানুষের অন্তর্নিহিত মহৎ সত্তার বিকাশের মাধ্যমে একটি উন্নতর ও মহত্তর সমাজ বিনির্মাণের। আমাদের সমাজে যখন ধর্ম নিয়ে প্রবল তর্ক-বিতর্ক চলছে, হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিভেদের রেখাটা স্পষ্টতর হয়ে উঠছে, তখনও তিনি উদার ও মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামের মর্মদর্শন ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি মনে করতেন, ‘জ্ঞানের দ্বারা মনকে চাষ না করতে পারলে ধর্ম পালন হয় না।’ (রায়হান। লুৎফর রহমান রচনাবলী, পৃ: ১৮২।) তিনি আরও বলেছেন, ‘জীবনকে নির্মল, সত্যময়, সুন্দর, ঈশ্বরের যোগ্য, প্রেমময়, নিষ্পাপ, নির্দোষ করে তোলাই সমগ্র ‘মানবজাতির একমাত্র ধর্ম।..এই সাধারণ ধর্মের নাম আমি ইসলাম দিতে চাই। ইসলাম অর্থ শান্তি, মহাশান্তি।’

শিখাগোষ্ঠীর লেখক ও সংগঠকরা ছিলেন বিশ শতকের তৃতীয় দশকের সবচেয়ে প্রাগ্রসর চিন্তার ধর্মবোধসম্পন্ন মানুষ। অথচ আমরা আজও তাঁদের চিনতে পারিনি। যুক্তিবাদের আলো দিয়ে তারা ধর্মের ব্যাখ্যা করেছেন। শিখাগোষ্ঠীর প্রাণপুরুষ আবুল হুসেন ‘ইসলামের দাবী’ নামক এক প্রবন্ধে নিঃশঙ্কচিত্তে বলেছিলেন, ‘হজরত মোহাম্মদের নামের পূজা ও তাঁর মাহাত্ম্যের অন্ধ মোহ থেকে নিজেকে মুক্ত করে আমাদের জ্ঞানের রাজপথে এসে সাধনা রত হতে হবে, এবং সমাজ জীবনে ‘তাখাল্লাকু বি-আখাবিল্লাহ’ (হজরতের বাণী) সার্থক ও সফল করে তুলতে হবে।’ কাজী আবদুল ওদুদ আরও এক ধাপ এগিয়ে বলেন, ‘আল্লার গুণাবলীতে বিভূষিত হও, আল্লার গুণাবলীতে বিভূষিত হওয়ার অর্থ অনন্ত সদগুণে ভূষিত হওয়া, কাজেই মানুষের উন্নতির অন্ত নেই-।’

এ থেকে বোঝা যায়, মুসলিম সাহিত্য সমাজের চিন্তক-লেখকগণ মহানবি ও ইসলাম ধর্মকে অন্তর দিয়ে মেনেছেন, অন্ধভাবে নয়। ইসলামকে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন স্বচ্ছ ও মুক্তবুদ্ধির আলো দিয়ে, গোঁড়ামি দিয়ে নয়। পারস্যের শেখ সাদি ছিলেন শিখা গোষ্ঠীর লেখকগণের প্রিয় কবি। শেখ সাদির কবিতা কাজী আব্দুল ওদুদকে অনুপ্রাণিত করেছে। মহানবির প্রশস্তিসূচক শেখ সাদির পঙক্তিমালা তিনি বারবার পাঠ করতেন: ‘বালাগাল উলা বে কামালিহি।/ কাশাফাদদুজা বে জামালিহি।’ অর্থাৎ উৎকর্ষে তিনি মহৎ ও মহীয়ান। তাঁর সৌন্দর্যে সব অন্ধকার দূর হয়েছে। মুসলমান সমাজকে কুসংস্কারের অন্ধগলি থেকে জ্ঞানের রাজপথে নিয়ে আসার জন্যই শিখা গোষ্ঠীর সকল সাধনা ও কর্মপ্রয়াস পরিচালিত হয়েছে। বাঙালি মুসলমান সমাজের উন্নয়নে অনেকেই ব্যক্তি পর্যায়ে কাজ করেছেন। কিন্তু শিখাগোষ্ঠীর তরুণদের তৎপরতার মধ্যে ছিল সামষ্টিক চেতনা। সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে কেবল স্ব সমাজ ও স্বধর্মের ঋণ শোধ নয়, ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে যে-ভ্রান্ত ধারণা চালু রয়েছে সেসব ধারণার রাহুগ্রাস থেকেও বাঙালি মুসলমানকে তাঁরা মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পারেননি। বরং জ্ঞানের আলো জ্বালাতে গিয়ে নিজেরাই পুড়ে মরেছেন।

তাঁরা বিশ্বাস করতেন, ইসলাম একটি সর্বজনীন ধর্ম, মুক্তবুদ্ধির ধর্ম। এ ধর্মে কোনো অন্ধত্ব, গোঁড়ামি, সংকীর্ণতা ও যুক্তিহীনতা থাকতে পারে না। আব্দুল ওদুদ, কাজী মোতাহার হোসেন মহানবি (সা.)-কে পথ-প্রদর্শক, মনুষ্যত্বের আধার, ‘একজন উঁচুদরের যুগ প্রবর্তক মহাপুরুষ’, দিব্যকান্তি সুদর্শন পুরুষ হিসেবে মান্য করেছেন। কিন্তু ইসলামের নামে আচারসর্বস্বতা ও আনুষ্ঠানিকতার বাড়াবাড়ি নিয়ে প্রশ্ন করতে দ্বিধা করেননি। আবুল ফজল আরবি ভাষায়

খোতবা পাঠের সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, ‘আরবে আরবিতে খোতবা পড়া হয়। সেই ধুয়া ধরিয়া আমরাও চলিয়াছি তাহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া। মনে করি, সুন্নত পালন করিতেছি। আর ভুলিয়া যাই আরবি আরবদের মাতৃভাষা, আরবি তাহারা বুঝে, আমরা তাহা বুঝি না অথচ পুণ্যলাভের দুরাশায় বুঝিবার ভান করিয়া হাহুতাশ করিয়া বুক ভাসাই।’ (তরুণ আন্দোলনের গতি, শিখা, তৃতীয় বর্ষ, ১৯২৯। পৃ:১৩৭)

সাধারণ মানুষ যাতে কোরআন ভালভাবে বুঝতে পারে, সেজন্য কাজী আবদুল ওদুদ পবিত্র কোরআন বাংলায় অনুবাদ করেন। অনুবাদের ক্ষেত্রেও তিনি স্বকীয়তার পরিচয় দেন। ধর্মচর্চাকে তিনি ‘আদর্শের বা শ্রেষ্ঠ চিন্তার আনুগত্য’ বলে মনে করেছেন। তারপরও সারাজীবন আবেগের চেয়ে যুক্তিকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। ‘হযরত মোহাম্মদ ও ইসলাম’ গ্রন্থে ধর্ম সম্পর্কে তিনি বলেন: ‘একালের ধর্ম বলতে জ্ঞান ও মনুষ্যত্ব সাধনাই মুখ্যভাবে বুঝতে হবে—ধর্মের আচার অনুষ্ঠানের দিক তার তুলনায় গৌণ,—জীবনে কোনটি মুখ্য, কোনটি গৌণ এই বিচার আমাদের মধ্যে যেন কখনো শিথিল না হয়, বিশেষ করে একালের জটিল জীবনায়োজনের দিনে।’ (হযরত মোহাম্মদ ও ইসলাম, কলিকাতা, ১৩৭৩। পৃ: ৩০৫) অন্যদিকে, কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল ফজল, মোতাহার হোসেন চৌধুরী প্রমুখ ধর্মকে যুগের প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করে গ্রহণ করার পক্ষে মত দিয়েছেন।

তাঁরা মনে করতেন, বাঙালি মুসলমান বহুকাল থেকেই যুগধর্ম উপেক্ষা করে সৃষ্টিশীলতার পথ থেকে দূরে সরে গেছে। মুসলমান সমাজের ধর্ম সম্পর্কিত উপলব্ধি মোতাহার হোসেন চৌধুরীকে ভীষণভাবে হতাশ করেছে। তাঁর মনে হয়েছে, এ সমাজ ধর্মকে যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে গ্রহণ করতে পারেনি। তাই এরা সৎ, সুস্থ, সুন্দর ও আনন্দময় জীবনযাপন করতে পারছে না। আচারিক ধর্মের ডোবাতে হাবুডুবু খাচ্ছে বলে আমাদের সমাজ ক্রমশ ধর্মান্ধ হয়ে উঠছে। প্রজ্ঞার অভাবে গভীর ধর্মবোধসম্পন্ন মানুষও তৈরি হচ্ছে না। অথচ প্রকৃত ধর্মবোধ ছাড়া ধর্মের মর্মমূলে পৌঁছানো সম্ভব নয়। তিনি অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় উচ্চারণ করেছেন:

‘.. শাস্ত্র পঠনের আবশ্যকতা তার থেকে অনুপ্রেরণা গ্রহণ করবার জন্যই, তাকে হুবহু নকল করবার জন্য নয়। .. শাস্ত্রকে উপেক্ষা করতে বলছিনে, মানুষকে শাস্ত্রের কাজে না লাগিয়ে, শাস্ত্রকে মানুষের কাজে লাগানোর কথা বলছি। অন্তরের অন্তস্তল হতে উৎসারিত প্রেম আর সমস্ত বিশ্ব-ব্যাপী অখণ্ড অদ্বৈতের অনুভূতিই ধর্ম।’

পশ্চাৎপদ ও দুর্দশাগ্রস্ত মুসলমান সমাজকে এগিয়ে নিতেই ‘মুসলিম সাহিত্য সমাজে’র অভ্যুদয়। সেই সঙ্গে ‘বুদ্ধির মুক্তি’ আন্দোলনের শুভ সূচনা। এ আন্দোলনের লেখক-সংগঠকরা ধর্ম ও যুক্তিকে পাশাপাশি রেখে অগ্রসর হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কালের বৈরী প্রতিক্রিয়া পদে পদে বাধা সৃষ্টি করেছে। যে-স্বপ্ন নিয়ে তাদের যাত্রা, তা মাঝ পথেই বাধার সম্মুখীন হয়। ফলে তাদের কোনো স্বপ্নই পূরণ হয়নি।

আমাদের দুর্ভাগ্য যে, গত শতকের ত্রিশ দশক পর্যন্তও বাঙালি মুসলমান-সমাজ শিখাগোষ্ঠীর মুক্ত, স্বচ্ছ, প্রাগ্রসর চিন্তা ধারণ করার জন্য যে বুদ্ধিবৃত্তিক সক্ষমতা ও পরিপক্বতা প্রয়োজন, সেটা তাদের মধ্যে ছিল না। কিন্তু শিখাগোষ্ঠীর লেখকরা ধর্ম ও যুক্তির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে ইসলাম ধর্মের একটি যুক্তিসিদ্ধ ও শাশ্বত রূপ সাধারণের মধ্যে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। ধর্ম ও যুক্তিকে দুই বিপরীত মেরুতে দাঁড় করিয়ে ধর্মযুদ্ধ করতে চাননি। আধুনিক বাঙালি মুসলমানকেও ধর্ম ও যুক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব না বাধিয়ে, বরং উভয়ের মধ্যে সার্থক সংলাপের আয়োজন করেই অগ্রসর হতে হবে। পশ্চিমাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হলেও যুক্তির ছায়ার নিচে আশ্রয় নিতে হবে। হিংসায়-উন্মত্ত, দ্বন্দ্ব মুখর পৃথিবীতে বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করতে পারস্পরিক সমঝোতা ও যুক্তিসিদ্ধ আলাপ-আলোচনার আবশ্যকতা অস্বীকার করা যায় না।

লেখক ও প্রবান্ধিক। উপাধ্যক্ষ, মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ, মেহেরপুর।

দারিয়াপুরে বাঙালি ঐতিহ্য শীতকালিন পিঠা উৎসব অনুষ্ঠিত

মুজিবনগরে দারিয়াপুরে জাঁকজমকভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো বাঙালির ঐতিহ্য পিঠা উৎসব ২০২৫। ইভুলেশন অব দারিয়াপুরের আয়োজনে, আজ শুক্রবার দিনব্যাপী দারিয়াপুর ভৈরব নদীর তীরে খেলার মাঠে এ পিঠা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পলাশ

মন্ডল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে দিন ব্যাপি পিঠা উৎসবের উদ্বোধন করেন।

ইভুলেশন অব দারিয়াপুরের সংগঠনের সদস্য ওয়াসিম আকরাম এর সঞ্চালনায় উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আযম, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি ওমর ফারুক প্রিন্স, সাধারণ সম্পাদক হাসান মোস্তাফিজুর রহমান, মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মিজানুর রহমান, দারিয়াপুর বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আনারুল ইসলাম।

আয়োজকদের মধ্যে ছিলেন, ইভুলেশন অব দারিয়াপুর সংগঠনের সদস্য ফয়সাল আহম্মেদ তামিম, আব্দুল জাব্বার, সালাউদ্দিন লিজন, তানভির হোসেন, সাজেদুল হক জীবন। পিঠা উৎসব সম্পর্কে আয়োজকরা বলেন প্রতিবছরই ইভুলেশন অব দারিয়াপুরের আয়োজনে বাঙালির ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে এবং নতুন প্রজন্মকে বাঙালির এই পিঠার সাথে পরিচয় করিয়া দেওয়ার জন্য এই পিঠা উৎসবের আয়োজন করা হয়। এবারও অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে এই পিঠা উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে এই উৎসবে বিভিন্ন গ্রামের যুবক যুবতী ও মায়েরা বাঙালির ঐতিহ্য বিভিন্ন ধরনের পিঠা তৈরি করে এই উৎসবে নিয়ে এসেছেন।

পিঠা উৎসবে মোট ২০টি স্টল দেয়া হয়। বাহারীসব পিঠার পসরা সাজিয়ে বসেছিল পিঠার কারিগররা। উদ্বোধন শেষে স্টল গুলো ঘুরে দেখেন অতিথিরা।